জাফরিকাটা খেয়ালী মন

শাঁওলী রায়

মহাবিশ্বে মহাকাল অখন্ডএক লয়তন্ত্রীতে সমস্তব্রহ্মান্ডের সঙ্গে অদৃশ্য ছন্দে বাঁধা। সেই মহাছন্দবন্ধনের কয়েক মুহূর্তকেরূপে-রসে-ছন্দে-বর্ণে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছে তারসংসারের যাবতীয় সঙ্গীত। সেই নান্দনিকবোধ কখনো প্রকাশ পেয়েছে আদিমমানুষের আঁকা গুহাচিত্রে, কখনো সংঘবদ্ধ নৃত্যে ও গীতে, গৃহসজ্জায়,পশুপালনে, শস্যচাষে এমনকি রন্ধনশৈলীতেও। বর্ণ,সুর এবং ছন্দ যখন একে অপরেরউৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে তখনই বেড়েছে সঙ্গীতময়তাও, অনেক কিছুরমতো সৃজন ইচ্ছাও মানুষের এক আদিমপ্রবৃত্তি। এর তাগিদেই মানুষসৃষ্টি করেছে শিল্প। চেতনা উন্মেষের সেই প্রত্যুষেপ্রকৃতি ছিল মানুষের কাছেসমস্ত শিল্প সৃষ্টির প্রধান অনুপ্রেরণা।প্রকৃতির কাছেই সে শিখল বর্ণের ব্যবহার,রূপের বিন্যাস। সুরের প্রাথমিক উৎসের সন্ধানও দিলো প্রকৃতি -বাকী ছিল অনিমেষ লয়ের মধ্যে এদের প্রতিস্থাপন করা - এভাবেইঅরূপ সঙ্গীত রূপ পেল মনুষ্য সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট ভাবনা মাধ্যমে।প্রথম প্রথম মানুষ অনুকরণ করেছে পশুপক্ষীর ডাককে। জানাযায়, সেই প্রবীণতম মানুষেরা তিনটিমাত্র প্রাথমিক স্বরে গান গাইতেন। জটিলতাহীন সেইসবসুরপ্রক্ষেপও হয়তো ছিলমানুষদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার আর এক সাক্ষী। ধবনি - সঙ্গীত আজও সেইধারায় বহমান। সুরদিয়ে সঙ্গীত বুনে দেয় মানব-অনুভূতিকে নানা বর্ণে।রসনির্মাণের সেই আনন্দঘন মুহূর্তে যখন শুনতে পাওয়া যায় "পিয়ানাহি আয়ে/বহুত দিন বিত গেয়ে" পদকর্তা শিল্পী - শ্রোতাউপনীত হন উপলব্ধির একই দোরে।

বর্তমান আলোচনাটিহিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির খেয়াল বন্দিশগুলি নিয়ে। মুখ্যত রাগ নির্ভরএই গানগুলি গড়ে ওঠার ইতিহাস জানতে হলে আরো পিছতে হবে। বৈদিকযুগেইআর্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব - অর্থাৎ ক্রমান্বয়েবর্ধিত স্বরব্যবহারের এই রীতিতে গান গাওয়া হতো।

সামগানগুলিতেতিনটি সুরের ব্যবহার ছিল উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত। প্রাচীনভারতের সঙ্গীত-আলোচক মাতঙ্গমুনির মতে মার্গসঙ্গীত রচনায় চার বাতদোধর্ব স্বরের প্রয়োজন।পাঁচটি বা তার থেকে কম স্বরের গান গাইতো শবর, পুলিন্দ, কাম্বোজ,কিরাত, দ্রাবিড় এবং জঙ্গলে বসবাসকারী আদিবাসীগণ। রামায়ণের যুগেই সাতটিশুদ্ধ জাতি-রাগের রূপের কথা জানতে পারা যায়। এর থেকে ভরতমুনিরূপদান করলেন আঠারোটি শুদ্ধ ও বিকৃত জাতি রাগের।

এর বহু বছর বাদে,আনুমানিক নবম খ্রীষ্টাব্দে মাতঙ্গমুনি বললেন, রাগগীতিগুলি তৎকালীন সময়েপ্রচলিত সাতপ্রকার গায়ন পদ্ধতির অন্যতম একটি। শুদ্ধ , ভিন্নক,গৌড়িকা, রাগ-গীতি, সাধারণী, ভাষাগীতি এবং বিভাষাগীতি। প্রসঙ্গত,মাতঙ্গমুনির 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থেই 'রাগ' শব্দটি প্রথমপরিচিতি পায়। এই গ্রন্থেই রাগের সাতটি প্রাথমিক ভাগের কথাও জানা গেল, যেমন টক্ক বা টহ, সৌবীর,মালভ - পঞ্চম, খাড়ব, ভোট্টরাগ, হিন্দোলক, টক-কৌশিক। ভারতেরনাট্যশাস্ত্রেই দেখা যায় রাগগীতিগুলি নাটক রচনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল।অর্থাৎ এই রাগগীতিগুলিই ছিল রসনির্মাণের মুখ্য মাধ্যম। এবং অন্য ছ'টিশ্রেণীর গীতিপদ্ধতির মধ্যে রাগগীতির আবেদনও বেশী হয়ে দেখা দিল। কারণরাগগীতিগুলিই মানুষ অনুভূতি আশ্রিত ভাব রূপায়ণে সবচেয়ে বেশী সক্ষমছিল।

নবম থেকে চতুর্দশখ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীততত্ত্বে একাধিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনসাধিত হয়েছিল। মাতঙ্গমুনিরচিতবৃহদ্দেশী গ্রন্থের পর বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত বিষয়কগ্রন্থ হলো নারদ রচিত 'সঙ্গীত মকরান্দ'। এই গ্রন্থেইসর্বপ্রথম রাগ ও রাগিনীকে আলাদা করা হয়। এবং সেখানেও বিচারকাঠি ছিলস্বরসমূহের রসনির্মাণের প্রকৃতি। পুংলিঙ্গ রাগ যেমন বীর্য, অহংকারভাবের প্রকাশক ছিল তেমনি প্রেমপ্রীতি, বেদনা, বিধুরতাপ্রকাশ পেল স্ত্রীরাগে। নারদ নপুংসক রাগ নামে আরেকটি বিভাগ করেনযা ভয় বা শান্তির মতো রসের প্রকাশক ছিল। নারদের গ্রন্থেই ২০টি পুংরাগ, ২৪টিস্ত্রীরাগ এবং ১৩টি নপুংসক রাগের কথা জানা যায়। নারদের পরবর্তীকালেওএকাধিক সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ রচিত হয় যেমন নাট্যলোচন, সরস্বতীহৃদয়ালংকার, সংগীত সময়সার, রাগার্ণব প্রভৃতি। এর মধ্যে ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দেশার্ঙ্গদেব রচিত সঙ্গীতরত্নাকর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থেআলোচিত হলো পূর্বপরিচিত রাগগুলির উৎস এবং বিকাশ স

স্পর্কে, রাগটিকী প্রকার ভাবপ্রকাশক তাও জানা গেল।

চতুর্দশ শতকে আমিরখুসরোর অভিভাবকত্বে ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে ঘটল উল্লেখযোগ্য দিক পরিবর্তন।এর আগেই রাগের শ্রেণী বিভাজন প্রশ্নে উত্তর ও দক্ষিণভারতীয়মার্গসঙ্গীত দুটি পৃথক ধারা বেছে নিয়েছিল। আমির খুসরো এবারে উড়িয়েনিয়ে এলেন পশ্চিমের হাওয়া। ফার্সী মুক্কামকে সাদরে মিলিয়ে নিলেন ভারতীয় রাগপদ্ধতিরসঙ্গে। হিন্দুস্থানী সংগীত-পদ্ধতি ভরে উঠল নতুন সম্ভাবনায়। তৈরী হলোকিছু সংকীর্ণরাগ।

রাগনির্ভর সঙ্গীত,সঙ্গীত-ইতিহাস অনুসারে মার্গসঙ্গীত পদ্ধতির অন্তর্গত। এই ধারণায় মনে হয়রাগসঙ্গীত যেন কিছুটা গর্বভরে এই মঞ্চে উপবিষ্ট থেকেছে। কিন্তু যেমনসাহিত্যের ইতিহাসে দেখা গেছে, মঙ্গলসাহিত্যের মতো লোকজ সাহিত্য ক্রমে ধ্রুপদীআসন পেয়েছে, ঠিক তেমনিভাবেই শুধু ফার্সী সংস্পর্শ নয়, মার্গসঙ্গীত স্বচ্ছন্দেঘোরাফেরা করেছে এবং অকাতরে গ্রহণ করেছে অনার্যজাতীয়দের কাছ থেকেও। সেই আদিবাসীদের নামগ্রহণ করে রাগেরনামকরণ করা হয়েছে কখনো শকরাগ কখনো বা পুলিঙ্গরাগ। আভীরী, ভৈরব,গুর্জরী - বহুল প্রচলিত এই রাগগুলিও নাম গ্রহণ করলকর্মসংস্থানগত সম্প্রদায়গুলি থেকেই। এই রাগের রূপ, যাকে বইয়েরভাষায় বলা যায় ধ্যান তাও একান্তভাবে মানবরসে সিঞ্চিত একটিউপাদান। মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম,প্রয়োজন মেটানোর পরেও অতৃপ্ত থেকে যায় একটি সৌন্দর্যপিপাসু মনন। তার পরিতৃপ্তির সন্ধানপাওয়া যায় সঙ্গীতে। এবং সঙ্গীতের মহত্ব এখানেই যে, সঙ্গীতেও কিন্তু জগতোধর্ব কোন বিষয়ের কথা বলা হয় না, কিন্তু যে রসসে নির্মাণ করে তা মানবজগৎ প্লাবিত করে দেয়।

আগেই বলা হয়েছে,প্রত্যেকটি রাগের একটি করেরূপ কল্পনা করা হয়েছে। দেবতাময়রূপ অর্থাৎ রাগরাগিনীর সেই রূপগুলিকেসংস্কৃতপদের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিখ্যাত রাগমালাছবিগুলির মাধ্যমে রূপদান করা হয়েছে সেই কল্পনারও। সাতটি রংব্যবহৃত হয়েছে যেন সাতটি রসের প্রকাশক হিসেবে। মানবজীবনেরহাসি-কান্না-সুখ-দুঃখ-বাৎসল্য-অভিমান-নানাবর্ণের প্রেম - সবই প্রকাশপেয়েছে এই রাগ কল্পনায়। প্রথাগতভাবেই কল্পনা করা হয়েছেদুটি চিরন্তন মানবচরিত্র - নায়ক এবং নায়িকা - এদের বয়ানে আধারপেয়েছে রস। পৃথিবীর যেকোন মহত্তম সৃষ্টির মতোই সঙ্গীতও শাশ্বতমানবমনের কোণায় লুকিয়ে থাকা ভাবনাগুলিকে সোঁচন করে এনে বিনুনিরমতো বুনে দেয় রসে। অবদ্ধ সেই ভাবনাগুলিতে হয়তো প্রেমের সঙ্গেইআছে উদ্বেগ, যৌবনের প্রমত্ততারসঙ্গেই আছে সংকোচ, অভিসারে যেতে গিয়েও আছে পিছনে ফিরে তাকানো -জগৎসংসারের সর্বশ্রেষ্ঠজীব মানবমনের এই যে জাফরিকাটা অনুভূতি -রাগসঙ্গীত একে প্রকাশ করল সুনিপুণভাবে।

বর্তমানকালে অবিমিশ্ররাগ ব্যবহার করে গাওয়া হয় যে সমস্তসংগীত, তার মধ্যে আছে ধ্রুপদ,ধামার, খেয়াল এবং কিছুটা মিশ্রভাবে হলেও মুখ্যত রাগনির্ভরেই গাওয়া হয়ঠুমরী, দাদরা, কাজরী প্রভৃতি শৈলীগুলি। আজকাল ধ্রুপদ ধামারতেমন ব্যাপকভাবে গাওয়া হয় না, কিন্তু খেয়াল তার সুর আর অলঙ্কারেরআবেদন নিয়ে এখনো রয়ে গেছে সুররসিকের প্রিয় গায়নপদ্ধতি হিসেবে।খেয়াল গানের বন্দিশগুলি সেই চিরায়ত মানবপ্রকৃতিরসূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রবণতার নির্ভরযোগ্য দর্পণ। রাগনির্মিত রস এবংবন্দিশের বাণীর মাধ্যমে মানবঅনুভূতি পেলো নতুন মুক্তি। সুরে বাণীতে একাকারহয়ে শু হলো নতুন পাঁচালী রচনা। মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাপনেরগল্প সজ্জিত হলো বেনারসীর বৈভবে। পদকর্তার জীবনবোধসমৃদ্ধ মাববিক আবেদনসন্ধান দিল ভাবের নতুন অমরাবতীর।

জৈনপুরের সুলতানহুসেন শর্কীর আমলে প্রথম খেয়াল রাজন্যমান্যতা পেল। মোগল বাদশাহ মহম্মদ শাহের (১৭১৯ -১৭৪০) সভাগায়ক সদারঙ্গ এবং অদারঙ্গ কয়েক হাজার খেয়াল রচনা করেশিষ্যদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলেন। অন্যদিকে খেয়াল গানের যে দ্রুত বন্দিশগাওয়া হয়, তা জনপ্রিয় করেন কববাল গায়কেরা। এঁরা ছিলেন হজরৎআমীর খুসরোর উত্তরাধিকারী। খেয়াল বন্দিশেই মানবমানবীর চিরন্তনসম্পর্কের কথা শোনা গেল। শোনা গেল সমাজসংস্কৃতির কথা, সমাজ কাঠামোরপ্রতিস্পর্ধী একটি বয়ানও শোনা গেল নায়িকার ভাষায়। ভারতীয়সংস্কৃতিকে বলা হয় তা যথেষ্ট রক্ষণশীল। কিন্তু সেই দুশো বছর পূর্বেরচিত বন্দিশেই সমাজকুললাজ না-মানা এক সচেতন মানবী নিজের প্রেমের কথা অকপটে স্বীকার করলো। একটি খেয়াল বন্দিশ যখন গাওয়া হয়, তখন তা পরিবেশিতহয় অনেকগুলি কাঠামোর মধ্যে থেকে। তার মধ্যেই খোঁজ করলে পাওয়া যায়ফিলিদ্রির মতো কাজ করা মানবমনের হদিশ।

পানঘটয়া জানে নপাঁউ মৈঁ

বীবহি নাচন চাওয়তমোহন
কৈসে জলভর লাউঁমৈঁ
জো কহিএ কহসোঁয়াগত
তো কুললাজ লচাউঁ মৈঁ
নিত জুগ রাজ ইয়হীমগজৈবো
কৌ লৌঁ রারমচাউঁ মৈ ।। (পুরিয়াধনেশ্রী)
অথবা
মৈ বায়ো গইজমুনাপানী
দেখহতী মন মোহেলিয়ো মেরো
সঁওবাল হাত বিকানি সখী

মোরে মনবসীসাঁওয়ারী সুরত
লোক কহে বৈরানি
প্রগট ভইবলিহারি শামসোঁ;
লাগী পীত ন ছানি সখী।।(পরজ)

দুটি বন্দিশই দুটিরপরিপূরক যেন অথবা বলা যায়দুটি মানসিকতাই দুটির পরিপূরক।ভীষণভাবে নৈর্ব্যক্তিক বক্তব্যগুলি। জল ভরতে যাওয়ার মতো নিত্যদিনেরকাজের মধ্যেই দেখা হওয়া এবং তার থেকেই হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেএকটি কৃষ্ণকায় মুখমন্ডল। কিন্তু কুলনারী এও জানে যে, যেপ্রস্তাব মোহন করেছে তা মানতে গেলে কুললাজ ছাড়তে হবে।
সাঁবর দি সুরত মানুভাঁদিবে মৈডী সৈঁয়ো বে
বিন দিঠিয়াঁ মঁনু বালনাহি চিত চঢ় জাঁদি
ঝুমবপাঁদীবে।।
কৃষ্ণবর্ণেরপ্রেমিক তার ভালো লাগে না অথচ তাকে না দেখলে সন্তোষও আসে না।শুধু তার অন্তর বলে ভালো লাগার কথা, তাই সর্বক্ষণ শোনে তারনূপুরধবনি। এই নিক্কণই শোনায় সত্যিকারের মনের কথা, ভালোবাসার কথা।
অব পায়েলিয়া বাজনলাগিরে
ক্যায়সে কর আয়ুতুমরে পাশ অব

শাস ননদ মোরী জনম কে বৈরন
সবরঙ্গ পিয়াহু তোরদাস অব।। (পুরিয়াধনেশ্রী)
অথবা
বাজে মোরীপায়েলিয়া
শুনত আয়েশাস-ননদিয়া।

শাস ননদ মোরী মানতবতিয়া
পিয়া না ভেজী একহুপতিয়া।। (বৃন্দাবসী সারং)
বন্দিশগুলির মধ্যে যেসমাজের কথা পাওয়া যায়, সেখানেপ্রেমিকা নারীর একমাত্র প্রতিরোধ শাশুড়ি এবং ননদের প্রতি।তার উন্মুক্ত প্রেমিকামনে শিকল তুলতে চায় সংসারের এই দুই প্রবল পরাক্রমীব্যক্তি। অসংখ্য বন্দিশে পাওয়া যায় 'শাস ননদে'র সঙ্গে এই দ্বন্দের কথা। শাস-ননদেরএই চরিত্র কল্পনার মধ্যে হয়তো একটা রূপকও কাজ করেছে। যবতীয়সাংসারিক এবং সামাজিক প্রতিকূলতার প্রতীকবাহী এই চরিত্রদুটি।সেই রক্ষণশীলতা, সেই দৃঢ়বদ্ধ সংসারের বাঁধনের মধ্যেও

সতেজ থেকেছেপ্রেমিকার মন। এই প্রেমে সে নির্ভয়ে বলেছে তার যৌবন ইচ্ছারকথা।

বনবে বসেঁয়াঁ হুঁগী
আজ সুহাগ কী রাত
নবেশা কর গায়া।

চন্দ্র বদন পর নিপটকী
লোচন চমকত লরীয়া
বনাবনীকে মুখ তম্বোল
ধীরী বনায় অগনিত দুঁগি।। (ইমন)
অথবা
সলোনারে বালম মোরারে
সুহা বোলা অতরঙ্গ ভীনা
আজ সুহাগকী রাতে।। (ইমন)

বন্দিশগুলির মধ্যে নিঃসংকোচে মানবী প্রকাশকরেছে তার শারীর আর্তি।

পলকন সেঁ মগ মাঁ রে মাঙ্গ
কব ঘর আবে মোরা প্যারা।
তপত তুনাউঁ গরে লগাউঁ
তনমনধন ঊন পর করা
মেরাপ্যারা।। (ইমনকল্যাণ)
অথবা
বৈরিন হো গই হো গই রাত
ইসমেরে প্যারে কী লগ গইঁ আঁখে।
এরী সখী পিয়া সপনে মেঁ দেখে
কহিনা গএ কছু বাঁতে।। (জয়জয়ন্তী)

বন্দিশগুলি লক্ষ করলেই দেখা যায় কোন এককসরলরেখায় বক্তব্যগুলি এগিয়ে যায়নি। মনস্তাত্তিকচাপান-উতোরগুলি সহজেই লক্ষ করা যায় এই বন্দিশগুলি থেকে।নিদ্ধকক্ষের মধ্যে যে নারীর বাস, সে কল্পনা করে সেই পৃথিবীরযেখানে থ াকবে না কোনরূপ দমন, প্রেম হবে স্বচ্ছন্দ, সাবলীল, মুখর হবে তারযৌবন প্রিয়র সঙ্গে স্বাভাবিক মিলনে। বন্দিশগুলিতে যে গন্ধ- বর্ণ -নায়িকার দৈহিক লজ্জার বর্ণনা আছে সেগুলিও ভীষণ সরব প্রেমপ্রকাশে। গুর্জরী তোড়ীর একটি বন্দিশে দেখা যায় সেই আবেগপূর্ণপ্রতীকের ব্যবহার।
ভরন চলি পানিয়া যমুনকো
এ্যায়সো তো যুবতীনার কর সিঙ্গার
বারবার মন মোহে লিও।

একত চুনরিয়া লাল রঙিলে
মাথে বিন্দিয়া অত চটকিলে

অপর বশত চাল মাতওয়ারে।

অথবা বেহাগের একটি বন্দিশে শোনা যায়

লট উলঝি সুলঝা যা বালমা
পিয়া তোরী হাত মে মেহন্দি লাগি হ্যায়।

মাথে কি বিন্দিয়া বিখর গইহে
আপনেহি হাত লাগা যা বালমা।।

অথচ এই সাজ, এই আভরণ যখনই তার অভিসারেরপথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তখনই বিনা দ্বিধায় সংসারমান্য শালীনত ার বেড়াও ভেঙ্গে ফেলেছে সে।

অঙ্গ চণ্ডাল রজনি কর সখী
অভিসার না জিয়া উৎসুক ভইলা
তমত তিমির পট নিকস বিশাল।

কোংকন ছাঁড় করী ছঢ় মেখল
মুখর মন্জীর ন মূক কর ডার
অবগুণ্ঠিত সৌঁ লীন কব গাও
কা করা সখী অব বীতত কাল।। (পুরিয়া)

কোন একমুহূর্তে মনে হতেই পারে রাধার প্রেমআর্তি, মীরার কৃষ্ণসঙ্গপ্রার্থনা অথবা সুদূর দক্ষিণের ভক্তি যুগের কবি অন্ড ালের সমাজসংস্কারের নিগড় ভেঙ্গে মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্তি-প্রেমের দৃঢ় ঘোষণা -- এসবেরসঙ্গেই বন্দিশের ভাবনার আশ্চর্য মিল আছে।
কিন্তু কোন একটি বিশেষ ধারার সঙ্গেই বন্দিশেরব্যবহারকে মেলানো যায় না। প্রেমের বিভিন্ন প্রকাশের সঙ্গেই শোনাযায় এক নির্মোহ প্রাণের ঘোষণা--
মনরে সুন পূরণ ক্যা কীতা
মোহ লগন কী গৈলন ছাড়য়ো
কাম অমল মদ পীতা।
সুত বনিতা বন্ধুকে কারণ
পচি পচি জনম বিতীতা।।
এযেন চর্যাপদে বৌদ্ধভিক্ষুকদের জীবনদর্শন আহৃত বক্তব্যের অনুরণন। যেমনসেখানে শোনা গিয়েছিলো
কা আ তবর পঞ্চবি ডাল
চঞ্চল চিএ মাঝে পৌশে কাল।

একান্ত জীবনবোধ দ্বারা সৃজিত এই বয়ানে আছেযেমন সংস্কারের কাঠামো, নিয়মনীতির শৃংখল, আছে যুগান্তের বয়ে অ াসাজীবনচর্যা-- তেমনই আছে ব্যক্তি মানুষের কাঙ্খিত নান্দনিক চেতনাকে পরিতৃপ্তকরার উপাদান। এ পর্যন্ত বন্দিশের ক াব্যগুণ বিচারে যে পথ ব্যবহারকরা হয়েছে, সুরের মোড়কে যেই তাকে সাজিয়ে ফেলা যায়, তা আর নেহাৎজাগতিকতার

প্রেক্ষিতে আলোচনার গণ্ডীতে বাঁধা থাকতে চায়না।ছড়িয়ে পড়ে মানবিক চেতনার অসীমতায়, কোন একটি রূপ-রসের নিরিখেতখন তার বিচার করার অবকাশ থাকে না।

ফলে এবার চলে যেতে হয় রাগ পরিবেশনা অর্থাৎবন্দিশটিকে যখন একটি নির্দিষ্ট রাগরূপে, নির্দিষ্টতালের নীতিতেগাওয়া হচ্ছে -- সেই পরিপ্রেক্ষিতে। রাগ পরিবেশন এবং শ্রোতার মনেরস নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি বিপরীতমুখী তরঙ্গস্রোত সৃষ্টি হয়। তারএকপ্রান্তে থাকেন শিল্পী যিনি রাগপরিবেশনের যাবতীয়উপকরণ নিয়ে সুরস্রোত সৃষ্টি করেন এবং তার বিপরীতপ্রান্তে থাকেন শ্রোতা, যার মননে ক্ষরিত হয় একাধিক রস। এইপারস্পরিক আদানপ্রদানেরমাধ্যমেই গড়ে ওঠে একটি সুরসম্পর্ক শিল্পী এবং শ্রোতার মধ্যে।

কোন একটিরাগের দু' একটা বন্দিশ নিয়ে আলোচনাটি শু করা যেতে পারে। ধরাযাক, এক সন্ধ্যায় শিল্পী পরিবেশন করছেন রাগ ইমন। কল্যাণ ঠাটে নিবদ্ধ,বাদী গ, সম্বাদী নি --- নিয়ে ইমনরাগের এক বিশাল সাম্রাজ্য। সন্ধ্যের প্রথমভাগে গাওয়া হয় ইমন। শেষ বিকেলের লাল আভাটুকু তখনো যেন রয়ে গেছে---সেই আবহে শু করা হয় ইমন। আগেই বলা হয়েছে, খেয়াল বন্দিশ যখন পরিবেশনকরা হয়, তখন তা করা হয় একাধিক কাঠামোর মধ্যে থেকে। প্রথমতঠাটের শৃংখলা তো থাকেই। এছাড়াও আছে ইমনরাগের একটি স্বতঃসিদ্ধরাগরূপ নি্ রে গ রে, নি্ রে গ ম প ম রে গ রে সা এইস্বরবন্ধনের মধ্যে বাঁধা থেকেই গাওয়া হয় ইমন। এছাড়াও একটি বিশেষ বন্দিশবিশেষভাবে নিবদ্ধ থাকে। সাধারণতঃ শিল্পী বিলম্বিত তালে শুরু করেন একটি বন্দিশ। এরআগে থাকে রাগের রূপটি শ্রোতার কাছে চিনিয়ে দেওয়ার পালা। এর নামআলাপ। আলাপের মাধ্যমেই শিল্পী রাগটির সম্পূর্ণ রূপ দিয়ে দেন আলতোসুরের টানে। এর পরে একটি নির্দিষ্ট তালে নিবদ্ধ বিলম্বিত খেয়ালপরিবেশন শু হয়। এই যে তালের বন্ধন এ যেন গানের বিস্তীর্ণ পরিসরকেএকটি নিয়মে গেঁথে ফেলার প্রচেষ্টা। সদারঙ্গের একটি বন্দিশ দিয়েআলোচনা শু করা যাক, দেখা যাবে কেমন করে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে সুরেরপরত। ইমনরাগের একটি নির্দিষ্ট রাগরূপ আছেই, কিন্তু তার মধ্যেইঅনেকগুলি রঙের আভাস দেখা যায় এবং সেই বর্ণালীই ধীরে ধীরে তৈরি করেএকটি বর্ণময় আলপনা। সুরের খেয়াল আর তালের নিয়মের যুগলবন্দীতেই তৈরীহয় রসধারা।

মেরা মন বাঁধলিনোরে
ইন যোগীয়াকে সাথ।
সদারঙ্গ করমকরো কণা করুনা
ইন প্রাণনাথকে হাত।।

গুণী শিল্পী এই শব্দবন্ধের উপর এরপরেরাগটির বিস্তার আরম্ভ করেন। প্রথমে মধ্য সপ্তকের ষড়জকে কেন্দ্র করেচলে সুর প্রতিষ্ঠা। ষড়জের মাধ্যমে রাগের ভিত্তি প্রথমেস্থাপিত করে নেওয়া হয়। বলা হয় ইমন বা ইয়ামন-- এই রাগটির মাধ্যমেসান্ধ্যপুজোর এবং আরতির পরিমন্ডল তৈরী করা যায়। এবং যখন মন্দ্র সপ্তকেরাগের বিস্তার চলে তখন সত্যিই মনে হয় যেন তার প্রয়োজনীয়উপকরণাদির গুছানোর পর্ব চলছে।

নি্ নি্ নি্।ম্ ধ্নি্। নি্ নি্ নি্ধ্ নি্ সা
মে ব্দ রা ম s ন বাঁ ধ লিs নো রে

মন্দ্র সপ্তকে এই ষড়জ, নিষাদ, ধৈবত আর কড়ি মধ্যম দিয়েহয়তো সম্পূর্ণ এক আবর্তন হয়ে যায় বিলম্বিত একতালে। তাল তখন এক সময়বন্ধন।এক সন্নিবিষ্ট নিয়ম। বারবার বন্দিশের কথাকে সুরে ছড়িয়ে নিয়ে আবারফিরে আসতে হয় সেই আবর্তনে। শুধু বন্দিশ বা শিল্পী নয় এই আবর্তে বাঁধাথাকেন শ্রোতাও। এই জন্যই সম আসার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাও সেই ঝোঁকে তাল মেলান।গানটির সমস্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে যে তিনিও সংশ্লিষ্ট তাপ্রমাণিত হয় এর থেকেই। রাগের বিস্তার চলতে থাকে মধ্য সপ্তকে।ইমনরাগে মধ্য সপ্তকে রাগের বিস্তার সবচেয়ে বেশী বিকাশ লাভ করে।

মধ্য সপ্তকে গান্ধারকে ঘিরে চলে স্বরের জাল বয়ন।

নি্ রে গ গরে গনি্ গধ্ নি্ গ রে সা।

বন্দিশের কথার সঙ্গে এই যে স্বরগুলিতে গিয়েফিরে আসা, এর মধ্যে শ্রোতাহৃদয়েও একটি আকাঙ্খার মতো রস সৃষ্টি হয়। এই বিলম্বিত লয়ে মীড় এবং গমক সহযোগেএকটি নিবিষ্ট আবহ তৈরি হয়, যার মধ্যে শিল্পী ও শ্রোতা উভয়েই লীনহয়ে যান। এটা একটা পারস্পরিক সম্পর্ক। একটা সুরতরঙ্গ যা যুক্ত করেউভয়প্রান্তের দুই ব্যক্তিকে। সুরের এবার বিস্তার ঘটে মধ্যসপ্তকের পঞ্চম এবং নিষাদের মধ্যে। ইমনে নিষাদ প্রবল স্বর। শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর'অনুসরণে বলা যায়, নিষাদ বিচিত্র রঙের সমাবেশ ঘটায়। এবং তার থেকে ই এক কণা রসের উৎপত্তি হয়। এটা অন্য ভাবেওপ্রমাণিত করা যায়। যেমন, এই নিষাদে বিস্তার পূর্ণতা পেলেএকধরণের অপূর্ণতা শ্রোতৃমনেও দেখা দেয়। শিল্পী বারবার করেতার-সপ্তকের ষড়জকে ছুঁয়ে এসেও তাতে সম্পূর্ণভাবে ধরা দেয় না। এবং শেষমেষ যখনতারসপ্তকের ষড়জে বিস্তার আরোহণ করে, পূর্ণতা মেলে বিস্তারের,সেটা একটা যেন স্থিতিশীল অবস্থার রূপ নেয়। বন্দিশের বাণী শুধু'মেরা মন বাঁধলিনোরে ইন যোগীয়াকে সাথ' (স্থায়ী)কিন্তু ইমনরাগের বাঁধনে হাজার প্রকার ভাবপ্রকাশে, এই ভাবনাব্যক্ত করা যায়। সেখানে শুধু অ াটটি রসকে আলাদা আলাদা করে চেনানো সম্ভবনয়, এরা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এবং গান তখনই সার্থক যখন তা মানবমনকেসীমানার বাধা ছাড়িয়ে অসীমতায় পৌঁছে দেয়।

সদারঙ্গের বিলম্বিত বন্দিশটি নিয়ে আলোচনার পর,তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের প্রসিদ্ধ গায়ক এবং বন্দিশরচয়িতাদের রচিত পদগুলি নিয়ে আলোচনা করলেও দেখা যাবে,ভাষাতত্ত্বে যাকে বলা হয় .Rawstaffতা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক, কিন্তু তার থেকেই শিল্পিত রচনাকরবার নানাভাবে তার বিশিষ্টতার পরিচয় রেখেছে। বাদল খাঁ-এরএকটি ত্রিতাল বন্দিশে শোনা গেল তা ভক্তিরসে পূর্ণ।

দো জগমে শরণে রাখো মেরী
তুহি পাক পরবরদিগার।

প্যায়দা কিয়ে কি লাজ তুমহিকো
তুম দাতা হাম চেরী।

ত্রিতালের ছন্দকে এখানে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছেযে, বন্দিশকারের অভিপ্রেত বাণীটির উপরেই পড়েছে সম। সেখানেঅন্যমনস্ক হয়ে থাকা শ্রোতাটিও গানের লয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হন। এই ভাবেছন্দবন্ধের মধ্যেই বন্দিশের বাণীগুলি নিয়ে হয় নানা লয়কারীর কাজ।বিস্তারের লয় থেকে এতে লয় একটু বাড়ে। তাল এখানে প্রধাননির্ধারক। তালের পরিমাপের ছন্দে ছড়িয়ে দেওয়া হয় পদগুলিকে। সুরসহযোগে বাণীগুলি এক তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এবং যখন ত্রিতালে বন্দিশটি গাওয়াহচ্ছে তখন চার মাত্রা বা আট মাত্রা, বারো মাত্রা অথবা ষোলো মাত্রায় একটিসম্পূর্ণ সুরপ্রতিমা নির্মাণ করে নেওয়া যায়। কোন একটি বিশেষ রস নয়,নিবেদন, পূজার সঙ্গেই এই লয়কারী এমনভাবে করা যায়, যেখানে লাস্য ও শৃঙ্গারওধবনিত হয়। লয়কারীর ক্ষেত্রে তাল এক নির্ভরযোগ্য সহযোগী,মাত্রাগুলিকেও কখনো অর্ধমাত্রা বা দেড় মাত্রায় ভাগ করে একেবারেকথোপকথনের ভঙ্গীতেও ছুঁড়ে দেওয়া হয়। অপর প্রান্তে বসে থাকাশ্রোতা উদ্বিগ্ন হয়ে থাকেন এবং সম এসে যুক্ত করে নেয় শিল্পী এবং শ্রোতাউভয়কেই। মার্গসঙ্গীত একপ্রকার শাস্ত্র বহু বছরের সাধনায় সাধক পানসেই সম্পূর্ণতা যা নাড়া দেয় মানবমনকে। এবং নিঃসৃত করে একাধিক আকাঙ্খারূপ রস।

ভারতবর্ষের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সাধনায় বড়ে গোলামআলী খাঁ শ্রেষ্ঠ সাধক শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকেশোনা যায়, ফ্যানের রেগুলেটর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তিনি তানের রেওয়াজকরতেন। জড় জগতের এই যে এক অচেতন পদার্থ, তাকেও তিনি সজীব আদানপ্রদানে অংশগ্রহণকারী এক পদার্থে রূপায়ণ করে নিতে সক্ষমহয়েছিলেন। সঙ্গীতেরই এই সামর্থ্য রয়েছে যেখানে অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিওসঙ্গীতের দ্বারা নির্মিত বলয়ের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। বড়ে গোলাম আলী খাঁরচিত ইমনের একটি বন্দিশে শোনা যায় শুধু প্রাণের জয়ধবনি।

আজ রঙ্গ লাগা মোরা পিয়া আয়ে দ্বারে। ;
দেতো মুবারক সগরী মন্দিরক নরনারী মিলে।।

ত্রিতালে বাঁধা এই বন্দিশটিও নি রে গা ম ধ নি র্সা সেইসাতটি সুরেই বাঁধা কিন্তু অজস্র সহস্র স্বরের সংশ্লেষণে

(combination) তৈরী করতে পারেএই কটি স্বরই। বিস্তার, লয়কারীর পর এই বন্দিশটিতে করা যেতেপারে প্রথমে মধ্যলয়ে সরগম। পরে সেই লয় বাড়িয়েও নেওয়া যায়।বিস্তারের সময়ে যে স্বরে মীড় প্রয়োগ করা হয়েছে, সরগমেতাকেই ব্যবহার করা যেতে পারে বিনা মীড় প্রয়োগে, লয়কে এখানেওব্যবহার করা হয় নানাভাবে। ফলে একই স্বর একাধিক অবয়ব তৈরী করে নিতেপারে। যেমন

প ম গ ম প ধ প ম গ রে সা

এবং ম ধ প ধ ম প মগ ম গ রে সা

এবং গ ম ধ প ।sধ ম প ম গ ।প ম ধ প ম গ রেসা

এবং মধ ধধ পধ ধধ মs পপগম মs

গরে মগ পম গরে সা ইত্যাদি।

শুধুমাত্র দুটি বা তিনটি স্বর নিয়েও তৈরী করাযায় এক গভীর সুর আবর্ত।

ম ধ নি ।ম ধ নি ।ম ধ ।ম নি। ধনি

ম ধ। ম নি ।ধ নি ।নি ধ। নি ম। ধ ম।ধ নি।

নি ধ ।ধ ম ।নি ধ ম

এইভাবে কড়ি মধ্যম, ধৈবত, নিষাদ দিয়েও যেস্বরতরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তাও একধরণের ইচ্ছাপূরণের মতো যেন, একটা শেষনা হওয়া ক্রিয়া। সমুদ্রের স্রোত যেমন অগণিত সংখ্যায় কুলে আছড়ে পড়ে, তেমনিএই স্বরসমষ্টিও, একের পর এক জন্মগ্রহণ করে প্রতি মুহূর্তে,প্রতি পলে। আরো একবার এই প্রক্রিয়াটি মনে করিয়ে দেয় শাশ্বতমানবমনের। সেখানেও প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য অনুভবের জন্ম হচ্ছে। কোনটাপ্রকাশ পাচ্ছে, কোনটা বা প্রকাশ পায়না। এতেই শেষ নয়,এরপরে থাকে অমৃতরা জির মতো ছড়িয়ে দেওয়া তান এবং বোলতান, শুদ্ধতান,ছুটতান, কুটতান, মিশ্রতান, গমকতান, আলংকারিক, ফিরত ত ান, সাপটতান---- এদেরও একটি করে বিশেষত্ব আছে। রাগরূপকে অক্ষুণ্ণ রেখে যেসুরসমষ্টির বিন্যাস সেগুলিও চ ালচিত্রের মতো তুলে ধরে এক একটিরূপরেখা। কোনটা সরল কোনটা বা বিসর্পিল অথবা যৌগিক নক্সায় আঁকা যেনবিমূর্ত রসের সুরেলা অবয়ব। এই অবয়বই মানবমনে ধরা দেয় সুন্দরেরপ্রতিরূপে। সুর- লয়- ভাষার এই যে সমসত্ব মিশ্রণ এটাই একটাসম্পূর্ণতার বোধের সৃষ্টি করে। বোধের অন্তরতম স্থান, যাজীবনের মাধুর্য আর সাম্য খুঁজে বেড়ায়, সঙ্গীতই পারে তাকে তৃপ্ত করতে। এইগানেই মানুষ পেয়ে এসেছে পরম শান্তি। প্রেম, প্রীতি,ভালোবাসা দিয়ে মানুষের যে রূপসৃষ্টির আর্তি, সেই চেতনাকে যুগেযুগে পরিতৃপ্ত করেছে এই গায়নশৈলী। বর্তমান সময়ে যখন নানাদিক থেকে বারব ারঅনান্দনিক বোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, এই গায়ন পদ্ধতিই দেয় এক নিরাপদআশ্রয়। জাগতিকের মধ্যেই দেয় মুক্তির অ শ্বাস।